সিদ্ধার্থ সেন

আশ্চর্য দৃশ্যমালা

এক। আপনার মুখ আপনি দেখ

প্রায় এক যুগ পরে নিশ্মতি রাতে মিতা আসে। বহুদিন বাদে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম, অথচ ওর স্মৃতি আমাকে তেমন যন্ত্রণা দিচ্ছিল না অনেকদিন ধরেই। তবে কেন এই স্বপ্ন? স্বপ্নটা খুব অদ্ভুত: স্থান ডালহৌসি কিম্বা কোন অফিসপাড়া। সদ্য আলো জ্বালা মোহিনী রাত সবে প্রসাধনপর্বরসী হয়ে উঠতে শুরু করেছে। অথচ এমন একটা মন খারাপ করা সন্ধ্যা আর ডিপ্রেসিং আবহাওয়া, কি বলব। শহরে বড় ধরনের কোন গণ্ডগোল হয়ে যাওয়ায় রাস্তায় লোকজন কম। বাসটাস নেই বললেই চলে— তার মধ্যে হিমেল হাওয়া আর গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টি। হঠাৎ মনে হল একটা অদ্ভুত সুসজ্জিত গোলমতন গুদামঘরের ভেতর বসে আছি— কোনখানে কোন জানালা নেই তাতে। অবশ্য দেয়ালে সাঁটা ওয়ালপেপ্টার আছে— একটায় ঘন জঙ্গল, আরেকটায় নীল আকাশে অনেক উঁচু দিয়ে একঝাঁক সাদা পাখী উড়ে যাচ্ছে— এইসব। মনে পড়ে গেল, সেইদিনই সকালে কি একটা ঘটনায় আমি হঠাৎ নবাব বনে গেছি। (হয় লটারী, নয় কোন বিদেশী কোম্পানীতে এক্কেবারে বড়সাহেবের চাকরী যেখানে ডলারে মাইনে হয় কিম্বা হয়তো সিনেমার জন্যে লেখা আমার স্ক্রিপ্টটা ধুলোয় ভর্তি হয়ে আছে তার জন্যেই এন. এফ. ডি. সি.-র কল্যাণে আমার ভাগ্যে বিশ পঁচিশ লাখ টাকার শিকে ছিঁড়ে গেছে।)

এমন সময় উর্দিপরা একজন আর্দালীমতন লোক আমাকে সেলাম দিয়ে গেল "হুজুর মেমসাহেব এসে গেছেন"। আমি খুব নির্লিপ্ত গলায় হুকুম করলাম তাকে নিয়ে আসতে অথচ কোন মেমসাহেবেরই তো আসার কথা ছিল না। বলতে না বলতেই মিতা এল— পরনে একটা আগুন রঙের ছোট হাতা স্কার্ট, হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঝুল, তাতে সাদা, বড় বড় পোল্কা ডট্। (আসলে সাজপোশাকে ও বরাবরই খুব কনজারভেটিভ লম্বা ব্লাউজের হাতা, শাড়ি পরে আমার ফুলমাসীর মতন তাতে এতটুকু শরীর দেখা যায় না। আশংকা করি আজো ওর এমন বেশবাসই অক্ষয় হয়ে আছে— কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম আগুনরঙা স্কার্ট!) ওর চেহারা সেই প্রথম দেখার মতন— রূপ যেন ভয়ংকর ঝলসানো আগুন হয়ে জ্বলছে। আগের চেয়েও অনেক সুন্দর, আশ্চর্য শরীর। লম্বাটে তীক্ষ্ণ

মুখে অদ্ভুত সুন্দর চোখ, ধনুকের মতন জোড়া ভুরুর তলায় প্রখর দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। সেই প্রখর নাক আর ঈষৎ পুরু গোলাপী ঠোঁট। ও ঠিক সেইরকম করে ঠোঁট ওলটালো যেমন করে ওলটাতো প্রথম দেখার সময়ে (আর কি সুন্দর লাগত এই ঠোঁট বেঁকান, তাই যখন তখন খ্যাপাতাম ইচ্ছে করে)।

হঠাৎ মনে হল কখন বাইরের রাস্তায় চলে এসেছি— দুজনে হাঁটতে শুরু করেছি একসাথে। যেন কালই দেখা হয়েছিল, তারপর আজকের এই মোলাকাৎ। মাঝখানের একটা যুগ বিস্মৃতির অতল খাদে তলিয়ে গেছে। ভীষণ ঠাণ্ডা গলায় আমাদের কথা হচ্ছিল নারীপুরুষ সম্পর্কের ব্যাপারে— খুব থিওরিটিকাল লেভেলে।

ওর বক্তব্য বলতে বলতে দারুণ তাচ্ছিল্য ফুটে উঠেছিল মুখে চোখে :

(১) জীবনে প্রেম ট্রেম বলে কিছু নেই— সব ফিজিক্যাল ব্যাপার। নারীপুরুষ সব সমান এ ব্যাপারে— কিন্তু পুরুষদের মাতব্বরি আর মরালাইজিং অসহনীয়।

(২) পুরুষেরা আসলে বেসিকালি ভণ্ড এবং ইমপোটেন্ট অথবা কাপুরুষ।

(৩) পুরুষদের এই মেকানিক্যাল ব্যাপার যাকে ন্যাকামি করে 'প্রেম' বলা হয় তাকে এক্সপ্লয়েট করতে না পারলে মেয়েদের ডিগনিটি নিয়ে বাঁচা অসম্ভব ইত্যাদি।

বলতে বলতে একটা রহস্যময় গলির সামনে এসে দাঁড়ায়— সেখানে আলকাতরার মতন অন্ধকার— কিছু দেখা যায় না। এক মিনিট নিঃশব্দে জলপাতার সেপাই-এর মতন দাঁড়িয়ে আছি— দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিতা আবার ঠোঁট ওলটায়— 'কি হল ভাল ছেলে, এবার বাড়ী যাও।' আমি নড়তে পারি না। ও আবার কড়া গলায় হুকুম করে 'কি হল, কথা কানে যাচ্ছে না।' বলতে বলতে চোখে ঝলসে ওঠে শাসনের দৃষ্টি। আমি কিছুতেই নড়তে পারছি না দেখে বোধহয় দয়া হয়। 'তুমি না··· বড্ড মুশকিল করলে। জান, তোমাকে তো আমি কিছু দিতে পারব না। এক কাজ করতে পার··· তুমি রোজ এইসময়ে, আজ যেখানে দেখা হল··· ওইখানে এস। আমার সঙ্গে তুমি এইটুকু রাস্তা হাঁটতে পার রোজ।' বলতে না বলতেই সে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।···

বার্গম্যানের কাঁচা সংস্করণ— সতুর বক্তব্য,

সিনেমাটিক্যালি দারুণ— ভাস্কর বলল। স্বপ্নটা রঘুকে বলতে হবে। সতু এবং কয়েকজনের মতে যতই ম্যাজোকিস্ট হই না কেন, আসলে আমি একটা মেল শভিনিস্ট। আমাকে বাদ দিয়ে মিতার সুখী জীবনযাপন আমি দু-চক্ষে সইতে পারি না। আসলে তো দেশে ফেরার পর ১ স্বামী ২ সন্তান ও ১ এ্যাম্বাসাডার গাড়ী (তখনো মারুতি আসেনি) সহযোগে ও বেজায় সুখেই আছে। সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন, শোভে গ্রামোফোন, শোভে গ্রামো—।

অথচ গতরাত্তেই কালীর পায়ে মাথা রেখে অনেকক্ষণ মিতার মঙ্গলকামনা করলাম

(হায়, আশৈশব আমি মার্কসিস্ট বলে সবাই জানে। রেগে গেলে বাবা বলত 'মার্কশিট') তবে কেন শিয়রে রাখা কালীর ছবিটা সরাতে পারলাম না।) দি টেরিব্‌ল মাদার, তুমি আমাদের রক্ষা কর। আমি তো কোন ছার। মানিক বাড়ুজ্যে আর ঋত্বিক ঘটকও তাই করত। বাঃ মানিক আর ঋত্বিক। বেশ কনভিনিয়েন্ট উদাহরণ তো। আর সেই পারা ওঠা ঠাকুরদার আমলের গোল আয়নাটা— তাকেও সরানো গেল না। সেখানে আমার বিচিত্র মুখের চেহারা আমাকে ভেঙাতে থাকে প্রায়শই। আমি চোখ বুঁজি, দেখতে চাই না। তবু চোখ বুঁজলেও দেখতে পাই নিঃসীম শূন্যের এক গোল গর্ত, পারা ওঠা সেই গর্ত চকচক করে উঠে দেখিয়ে দিচ্ছে— এই দ্যাখ্ তোর মুখ, এইটা. এইটা তোর নাক, এইখানে একটা আঁচিল আছে আমি চীৎকার করে উঠি ঘুমের ভেতরে না না এটা আমার মুখ না, চোখ না, আমার ছবি না।

In the crossways of kisses
Years pass too quickly—
Shattered memory
Beware, beware, beware.

দুই। ডাইরী অফ এ জিনিয়াস

আসলে আমি একজন আদ্যন্ত ম্যাজোকিস্ট— এমন ধরনের সেই অনেস্ট ম্যাজোকিজম্ যা জনান্তিকে, ফিসফিস গোপনীয়তার শিহরণে তারিয়ে তারিয়ে গা শিরশিরিয়ে উপলব্ধি করার ভেতরে একটা বিকট মজা আছে— এমন সেই মজা যা তাবড় তাবড় পুরুষসিংহরাও মস্তিষ্কের কোন গোপন অন্ধকারের তাড়নায় মন্দ রোলিশ করে না— কিন্তু প্রকাশ্যে ? ধরণী দ্বিধা হও ! কানের ভেতরে যেন গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছে কেউ অথবা ফুটন্ত আলকাতরায় চোখ অন্ধ হয়ে গেলে যেমন হয় তেমন— যেমন লজ্জা হয়েছিল একবার ছোটবেলায়, কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য প্রসঙ্গে আর লজ্জার বিষয়বস্তু কিন্তু আমি নয়— আমার বাবা। আমাদের পুরনো ভাড়াবাড়িটার পেছন দিকে একটা খোলা বারান্দা ছিল— টানা। পেছনেই খুব উঁচু পাঁচিল আর ওধারে বিশাল খেলার মাঠ। সেখানে বল পেটাপেটি হত সারাক্ষণ আর প্রায়ই ফুটবল এসে পড়ত আমাদের বারান্দায়, বাবার শখের টবের ফুলগাছ তছনছ করে দিত। আমি তখন খুব ছোট আর তখনকার ছেলেছোকরারাও এত মস্তান বা বাঁদর হয়নি এখনকার মতন। বল ফেরত পাবার জন্য প্রায়ই দেখা যেত পাঁচিলের ওপর লাইন করে বসা ছেলেছোকরার দল আর রক্তচক্ষু বাবা তাদের ভীষণ ধমকে যাচ্ছে অনর্গল।

একদিন বল লেগে জানালার কাচ খানখান আর তাই শুরু হয়েছে প্রায় লংকাকাণ্ড। কচুমাচু ছেলের দল পাঁচিলের ওপরে বসা কোলাব্যাঙের মতন, বাবা ভয়ংকর

গলায় ধমকে চলেছে আর এককোণে আমি ইয়ো ইয়ো খেলছি আপনমনে।

হঠাৎ বাবা লাঠি নিয়ে খাট থেকে লাফিয়ে উঠতেই এক ঝাঁকুনিতে লুঙ্গি খুলে মাটিতে লুটোপুটি, ভেতরে কিচ্ছু পরা ছিল না, একদম। এক সেকেন্ড নীরবতার পরেই প্রচণ্ড আকাশ ফাটানো সমবেত অট্টহাসি আর ধুপধাপ করে হনুমানের লাফ "দাদু ল্যাং ল্যাং দাদু ল্যাং ল্যাং"। কেন জানি না ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম খাটের বাজু ধরে। অনেকদিন বাবার হাত ধরে বেড়াতে বেরুলে চোখমুখ শিঁটিয়ে বুজে থাকতাম— ওরা যদি কেউ ধারে কাছে লুকিয়ে থাকে। সেইরকম লজ্জা ছিল অনেক পরে, যদি আমার হলদেটে, একান্ত নির্জন, নিষিদ্ধ ডাইরীটার গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যায়। অথচ তখন আমার, যাকে বলে ফর্মাটিভ স্টেজ। রোল অফ্ লেবার ইন দি ট্রান্সমিশন ফ্রম এপ টু ম্যান পড়া হয়ে গেছে বার চারেক। স্টেট এ্যান্ড রেভোলিউশন আর অরিজিন অফ ফ্যামিলি ইত্যাদি নিয়ে হাতাহাতি চলছে সকাল বিকেল। 'হারানের নাতজামাই'-এর স্ট্রীট ড্রামায় আমাদের হাততালি জুটছে মন্দ না। এই সময়েই একদিন সুধীরদার মুখ বেজায় কাচুমাচু। সদ্য বিয়ে করেছে অল্প বয়সে পার্টির মেয়েকেই। ফলে বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেবার পর কোন এক মেসে জুটেছে তারা অবশ্যই অন্য সব দাদাদের (অর্থাৎ বড় কমরেডদের) সাহায্যেই। শিগগীরই বাচ্চা হবে সুধীরদার বৌ-এর। কিন্তু কি সর্বনাশ ডেট দিয়েছে নাকি দোসরা অক্টোবরেই— গান্ধীজয়ন্তীতে। ভাবা যায়, সুধীরদার ছেলে (কমরেডরাও 'বাচ্চা হবে' বলত না, বলত — এখনো বলে কিনা জানি না— 'ছেলে হবে'— তবে এখন অবশ্য শোনা যায়, সেক্সের ক্লাশ ক্যারেকটার নিয়ে অনেক কাজকর্ম হচ্ছে)— সুধীরদার মতন বিপ্লবী, তার ছেলে হবে কিনা ওই গান্ধীর জন্মদিনে। তার ওপর 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও গান্ধী' নিয়ে সুধীরদার লেখা দারুণ হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল তখন। সত্যু মুখ টিপে খ্যাক খ্যাক করে হাসে। আরে দোসরা অক্টোবরে আরো একটা দিন আছে। চীন বিপ্লবের তারিখ সব ভুলে মেরে দিলে? আমরা হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। কিন্তু আমার আতংক থেকে যায়। ভাগ্যিস দোসরা অক্টোবরে। যদি মুসোলিনির জন্মদিনে ব্যাপারটা হত? আচ্ছা সুধীরদার বৌ শুনতে পেলে কি ভাববে? আমাকে তেড়ে মারতে আসবে না এইসব ইয়ার্কি শুনে? ভাবতেই কেমন গা শিউরে ওঠে। অদ্ভুত সেই আতংক আর কোথায় সেই আতংকের ভেতর একটা গোপন সুখের শিহরণ আছে কেননা সুধীরদার বৌকে দেখলেই আমার মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় ইস্কুলের অপর্ণাদি— কি অদ্ভুত মিল হাঁটাচলায়, শরীরের গড়নে। ···অনেক পরে আমার ডাইরীর অংশবিশেষ সিনেমার স্ক্রিপ্ট করেছিলাম। আমার কাকাবাবু— বিশ্ব-বিখ্যাত পরিচালক— ধৈর্য ধরে শুনেছিলেন। নিজের জুলপিতে মোলায়েম করে আঙুল ঘষতে ঘষতে (ওটা তাঁর একটা ম্যানারিজম্ ছিল) চোখ বুঁজে বলেছিলেন "বেশ একটা ধাঁচা আছে কিন্তু··· অন্যরকম। ভেবে দেখ, দারুণ সুরেয়ালিস্ট ছবি হতে পারত কিন্তু। তবে কি জান, এদেশে ম্যাজোকিজম্ ইজ নট ইন ফ্যাশন। খাবে না··· খাবে না।"

আসলে ওটা আমার একটা রোগ, একটা যন্ত্রণা যা কুরে কুরে খায়। হায়, আমার মনোবিকলনের তীব্র যন্ত্রণা লাঘব করতে চাইলেও কোন ডাক্তার দেখাতে পারি না কেন? সুধীরদা (সব খুলে বলিনি অবশ্য সুধীরদাকে— পাগল?) অবশ্য একজন নামকরা মনোবিজ্ঞানীর কাছে পাঠিয়েছিল। দোরগোড়া থেকে ভয়ে পালিয়ে এসেছিলাম, কেননা আবিষ্কার করেছিলাম, উনি আমাদের কেমন কেমন যেন আত্মীয় অথবা বাবার বন্ধুর বন্ধু— পাগল, আর যায় কেউ ওখানে? শিশির অবশ্য আমাকে বড়ুয়াদার কাছে নিয়ে গিয়েছিল। নির্জন চেম্বারে অনেকক্ষণ তিনি সব শুনেছিলেন। ফীস্ নেননি— দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বলেছিলেন, "কি মুশকিল জান, ওটাতো তোমার রোগ নয় ওটা যে তোমার স্বভাব।" সেদিন নিশুতি রাতে আমার কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। হলদেটে নিষিদ্ধ ডাইরীটা অনেককাল বাদে অলঙ্ঘ্য কোন নির্দেশে খুলে বসতে হয়। নির্জন, একান্ত কথা, শুধু কথার আঁচড়, আঁচড়ে কামড়ে আতঙ্ক করে দিতে দিতে স্পষ্ট হয় অনেকদিনের পুরনো সেপিয়া কালারের বিবর্ণ ছবির মুখ। সেই প্রতিমার মতন লম্বাটে ভরাট মুখ। মহিষাসুরমর্দিনীর মতন তেজী, ঋজু শরীরের বাঁধন। ধনুকের মত জোড়া ভুরুর তলায় বিশাল একজোড়া চোখ অসম্ভব কালো— অন্ধকারেও যেন ধক্‌ধক করে জ্বলে। তীক্ষ্ণ ঈগলপাখীর মতন নাকে ডালিমরঙের টুকটুকে নাকছাবি আলো করে আছে। ঈষৎ পুরু ঠোঁট পানখাওয়া লাল। একটু ঠোঁট খুললেই ঝকঝকে দাঁত ঝিলিক লাগায়।

এ মা গায়ের রঙ কি কুচকুচে হয়ে উঠেছে। আর কি যেন মাখা মুখে, গর্জনতেলের মতন, তাতে মাখনের মত গলে গলে পড়ছে কালো রঙের মহিমা। শেষ বিকেলের পড়ন্ত আভা এসে পড়ছে মুখে। আমাদের বিশাল ছাতের সবুজ শ্যাওলাধরা ক্রিকেট পিচের আলো রোদ গড়িয়ে শেষ বিকেল পেরিয়ে নিবু নিবু করছে। একটা দমকা হাওয়া উঠে আমার খোলা পিঠে সুড়সুড়ি ধরিয়ে দেয়— কি গুমোট গরম গেছে দিনটার। সুড়সুড়ি ধরানো হাওয়ায় অজানা আতঙ্কের ইঙ্গিত যেন শিউরে শিউরে ওঠে আমার সারা শরীরে। পালকছাড়ানো মুরগির মতন নিরালম্ব, তীব্র আতঙ্কের অনুভূতি হয়। আজ ঠিক দেখে ফেলেছে, দেখে ফেলেছে··· এতদিনের ভয়ংকর কেলেংকারী। ছাতের চিলেকোঠার পেছনে অনেক বছরের পুরনো সব মূর্তি— কোনটা নাকভাঙা, রঙচটা কোনটার হাড়গোড় বেরিয়ে আছে। যাই যাই করেও টিকে আছে তারা— খোয়াল করে আর বারোয়ারী পুজোর ভাসানে দিয়ে দেওয়া হচ্ছে না কোনবারই। বাড়ীর পুজোর মূর্তিই সব। কোনটা লক্ষ্মী কোনটা সরস্বতী। পুরনো নিয়ম অনুযায়ী কারুরই বিসর্জন হওয়ার কথা নয়। আমার সবচেয়ে আদরের সরস্বতী প্রতিমা, গত বছরের আগের বছর এসেছিল, প্রায় আমার বুক সমান উঁচু। এখনো কি তার জেল্লা। সবে ক্লাশ নাইন চলছে— অর্থাৎ তখনকার হায়ার সেকেন্ডারীর প্রথম ধাপ। তাই সরস্বতীর প্রতি আনুগত্য সবচেয়ে বেশী হবার কথা। তার ওপর সায়েন্স স্ট্রীমের প্রথম চালু হওয়া বিকট বিকট অঙ্কের

আতংক। প্রথম যেবার মাটিছোঁয়া প্রণামে আনুগত্য স্বীকার করেছিলাম ওই সরস্বতীর কাছে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলাম অসম্ভব ফর্সা পায়ের নীলচে শিরা নিঃশ্বাসের মতন ওঠানামা করছে। সেই দৃশ্য দেখে ঘুমোতে পারিনি সারারাত, প্রবল উত্তেজনায়। পুজো শেষ হয়ে যাবার অনেক পরেও যতবার ছাতের ওই সরস্বতীর কাছে গেছি ততবারই অস্পষ্ট অনুভব করেছি অপসৃয়মান কোন পমেটমের গন্ধ, লুপ্ত মাথাঘষার সৌরভ। কিংবা সুগন্ধি নিঃশ্বাসের হাওয়া। আশ্চর্য চোখ দুটো যেন হাসছে। কখনো আবার বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে কম্পিত হয় তার ভুরু, প্রবল শাসনেই দৃপ্ত প্রখর হয়ে ওঠে চোখে। আমি সইতে পারি না, অভূমি আনুগত্য স্বীকার করি, জন্মজন্মান্তরের দাসত্ব প্রার্থনা করি সঙ্গে সঙ্গে। আরো কাছে আরো কাছে এগিয়ে এলে অদ্ভুত রহস্য রোমাঞ্চ হয়। আতংকের আর কোন গোপন সুখের তীব্র অনুভূতি আমাকে ফালা ফালা করে দেয়। আমি তার গালের কাছে আসতেই বীণা ধরা হাতের উদ্ধত বাহু তীব্র শাসনের হুকুমজারী করতে থাকে। আর তক্ষুনি আবার খিলখিলে হাসি শুনতে পাই "কি বোকা তুই, কি ভীতু, ভীতুর ডিম।" আমি সাহস করে এগিয়ে যেতে যেতেই লজ্জায় ভেঙে পড়ি ছিঃ ছিঃ কি পাপ, আমার পাষণ্ড আচরণে সরস্বতীর ঠোঁটের চটা খুলে খুলে পড়ছে। আর তক্ষুনি, আমাদের চিলেকোঠার ভাড়াটে মালকিন, পাড়ার ইস্কুলের দোর্দণ্ডপ্রতাপ হেডমিসট্রেস অপর্ণাদির সদ্য বিকেলের গা ধোওয়ার পরে তোয়ালে দিয়ে ভিজে চুল আছড়ানোর শব্দ আসে। আমি মরমে মরে যাই। দিদিমণি ঠিক দেখতে পায়। শেষ বিকেলের নিবু নিবু আলোয়, অসম্ভব সাদা অর্থাৎ শ্বেতশুভ্র আমার রূপসী দেবীর ব্যাকগ্রাউন্ডে এ কি দৃশ্য। কালো ব্রোঞ্জের মূর্তির মতন মহিষাসুরমর্দিনী। খোলা চুল, চুড়ো করে বাঁধা হল টানটান— অসম্ভব টাইট। এত টাইট যে টনটনে হয়ে ওঠে গলার রগ, কানের লতি। ভিজে দু-একগাছা চুল কানের পাশ দিয়ে লতিয়ে আছে — সেখানে মুক্তোর মতন টলটল করছে একবিন্দু জল। কান দুটোই যা বিশ্রী দিদিমণির। বিশাল, পুরু আর ভারী, উল্টানো খণ্ডতর মতন— গায়ের রং কুচকুচে হয়ে উঠেছে কানের প্যাঁচের গভীরে— কোন নিষ্ঠুর লাগে ওই জায়গাটায়। গালের কালো তিলটা খুব স্পষ্ট হয়ে উঠতে টের পাই আরো কাছে আরো কাছে চলে আসছি দিদিমণির। লাল কল্কা পাড় তাঁতের শাড়ীটা পরে আছে আর দুধসাদা ছোট হাতা ব্লাউজ টানটান করে ফুটে উঠছে উদ্ধত বাহু— বাহুমূলের অন্ধকার রেশমী কোমলতার কল্পনাতেও কেমন শিউরে উঠতে হয়। কাছে আসতেই খুব চেনা সেই গন্ধটা নাকে আসে পাউডার আর জর্দা পানের গন্ধ, লালনীল পেন্সিলের গুঁড়োর গন্ধ আর বাটার জুতোর ছাপ দেওয়া চক্‌চকে হলদে স্কেলের সোঁদা গন্ধ— আদরের গন্ধ, শাসনের গন্ধ, শাস্তির গন্ধ।

ঈষৎ পুরু, অল্প ঝোলা ঠোঁটে একটা রহস্যময় হাসি ফুটে উঠতেই স্পষ্ট হয় ঝকঝকে গজদাঁত। আমার কান্না পায়— লজ্জায়, ভয়ে।

দিদিমণি ভারী ভিজে ফিসফিসে পুরুষালী গলায় ধমক লাগায় "ইস্ খুব যে ভক্তি সরস্বতীর আর ওঁদিকে যে সেকেন্ড টার্মনালে অঙ্কে পাঁচ পাওয়া পরীক্ষার খাতাটা আমার চালের ফোকরে লুকিয়ে রেখেছিস সে কথা কেউ জানে ?" আমি চমকে উঠি। আমার দেবী, আমার সরস্বতী দূরে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটে। "কেমন, এখন কেমন ?"

আমি ক্লীতদাসের মতন দিদিমণির মুখের দিকে তাকাই। অনেক কষ্টে হাসি চাপা ঠোঁট দেখতে পাই। শাস্তির হুকুম পাবার আগেই সম্মোহিতের মতন দিদিমণির পায়ের কাছে নীলডাউন হই। ততক্ষণে কালো পায়ে অদৃশ্য আলতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, সেইখানে মুখ রেখে হু হু করে কাঁদতে ইচ্ছে হয়। দিদিমণি আলতো হাতে কান মুলে দেয়। সেই সন্ধ্যা থেকেই বশ্যতাস্বীকার করতে হয়েছিল অপর্ণাদির শাসনের সাম্রাজ্যে। সারা সন্ধ্যে অঙ্ক পরীক্ষা নিয়েছিল দিদিমণি। তারপর রাতের খাওয়া শেষ হলে চিলেকোঠায় আবার ডাক পড়েছিল। তখনো কেন জানি না ইস্কুলের দিদিমণির মতনই সাজ পরা ছিল। সেই তাঁতের শাড়ী কল্কা পাড়, সাদা ব্লাউজ আর কাঁধে ঝুঁচ আর উঁচু চুড়ো খোঁপা। হাল্কা সেন্টের গন্ধ, ঘেরা দেওয়া টেবিল ল্যাম্পের আলো আর ডালিমরঙা নাকছাবির ঝলসানিতে অদ্ভুত লাগছিল। আমি আমার শ্বেতশুভ্রা দেবীর নাম জপ করতে করতে আবার নীলডাউন হয়েছিলাম। আমার কি শাস্তি হয়েছিল তা অনেক কষ্ট করেও স্মৃতির স্টুডিও থেকে আর উদ্ধার করতে পারিনি। কিন্তু ওই শারীরিক শাস্তির চাইতেও আজো দগদগে হয়ে আছে আমার নীলডাউন হওয়া ছবি, দিদিমণির কোলের ভেতর গোঁজা থুতনি। আঁর একটা আদরের হাত আমার সারা শরীর বুলিয়ে দিচ্ছে, আমার মুখ চেপে ধরেছে দিদিমণির কোল, আমার নাক হুঁয়ে যাচ্ছে ভেলভেটের মতন নরম পেটের ভাঁজ আর এই প্রথম— আমার দু-গাল জোর করে চেপে ধরে আমার ঠোঁটে, আমার কান্নাঝরা ঠোঁটে… । উঃ কি ভয়ংকর সেই শিহরণ, যেন গরম সীসে ঢেলে দেয় কেউ, অন্ধ আলকাতরায় চোখ অন্ধ হয়ে যায়। হায় আমার শ্বেতশুভ্রা, এই ছিল তোমার মনে ?

তিন। আশ্চর্য তারা

"এই শোন না, পঁচাত্তর বছর পরে সেই আশ্চর্য তারাটা নাকি দেখা যাচ্ছে রোজ শেষরাতে…শোনই না— তুমি তো ভারী বেরসিক দেখছি !

আমরা দেখতে পাব না ? চল না ওখানে যাই।"

"ওখানে ? ওখানে বোধহয় যাওয়া যায় না সশরীরে। লুই আর্মস্ট্রং গিয়েছিল একবার, তবে সেটাতো আরো অনেক কাছাকাছি।"

"মহাপাজী দেখছি। ওখানে যেতে বলেছি নাকি ? বলেছি, চল না কোথাও যাই

শেষরাতের আকাশ দেখবার জন্য।"

মিতা এবার আমার হাঁটুতে সজোরে ধাক্কা লাগায়। আমার অন্যমনস্কতায় বিরক্ত হয়ে এমন একটা আলটিমেটাম লাগায়··· ।

"দাঁড়াও, বলে দিচ্ছি তোমার পার্টির বড় কমরেডদের, তোমার ঘরে শিয়রের কাছে একটা বড় কালীর ফটো আছে এখনো।"

আমি শিউরে উঠি এই অভিনব বদমায়েসীতে। মিতা আবার ঠোঁট ওলটায়— সেই গোলাপী ঠোঁট, ভারী মজা লাগে। "আসলে কি জান তো, যেতে ইচ্ছে করে অনেক দূরে। ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড। নির্জন সমুদ্রের তীরে, কোন বালিয়াড়ির ওপর কিম্বা—।" আমার হাসি পায়। আমার কিছু ভাল লাগে না এখন। বরং কফি হাউসের ভ্যানভ্যানে ভীড়েই একা একা বেশ নির্জন লাগে— সেই নির্জনতার স্বাদ উপভোগ করতে বেশ লাগে। আর ওই ভীড়ের গুনগুন গুনগুন আওয়াজ বাড়তে বাড়তে কখনো মনে হয় যেন সমুদ্রের ধারেই আছি। আবার কখন বিকট আওয়াজের আছড়ে পড়া ঢেউ, আছড়ে পড়েই হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যায়। কফি হাউসের এই মজাটা আমি আর মিতা প্রায়ই গুণে গুণে দেখেছি। খুব শর্ট ইন্টারভ্যালের জন্য কখনো কখনো হঠাৎ চুপচাপ হয়ে যায় সবাই, অথচ সবাই সবার সাথে সাট করে, ড্রিল করার মতন একযোগে পা ফেলে এক সেকেন্ড নীরবতা পালন করাচ্ছে এমন মনে হয় না। তবে গঁটেটা মহাপাজী। যেদিন টেবিলে থাকে এই শব্দজল্পনা সব মাটি করে দেয়। ক্যালকুলেট করতে বসে হঠাৎ এই চুপ মেরে যাবার প্রোবাবিলিটি কত। একদিন পাজীটা উইলিয়াম ফেলারের বই পর্যন্ত নিয়ে এসেছিল আঁক কষে দেখবার জন্য, বাইনোমিয়াল ডিসট্রিবিউশন এক্ষেত্রে খাটে কিনা! কথা নয়, শব্দের আওয়াজের স্রোত। এই শব্দপ্রপাত শুনতে শুনতে এত মুগ্ধ লাগে যে আর কিছু কানে যায় না। মিতা ভারী রাগ করে ধুপধাপ করে উঠে চলে যায় কোনদিন।

প্রসূন বলছিল, আসলে এই ভাল লাগাটা একটা ধোঁয়াটেবাদের লক্ষণ— যতসব বুর্জুয়া স্পিরিচুয়ালিস্ট বিকৃতি। আমার তক্ক করতে ইচ্ছে হয় না— অবশ্য তক্কের গনগনে আঁচের মধ্যে একটা আনন্দও আছে, একটা খেলা, একটা মজার শব্দজব্দ, এত ইনভিন্সিব্‌ল এই শব্দের মহিমা না। অথচ চারদিকে নানাবিধ শব্দ আসছে ক্রমাগত। থিকথিক করছে পিউপা, লার্ভারা— কেউ বিপ্লবের, কেউ সংস্কৃতির, কেউ বিজ্ঞানের। দিকে দিকে মশাল জ্বলছে— এককোণে গ্রামসি, একটেবিল কডওয়েল, দু-চেয়ার ভালবাসা (শক্তি চাটুজ্যের সহযোগিতায়) মাঝখানের চার টেবিলে জোড়া দেওয়া "চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান" কিম্বা "গণফৌজে নাম লেখান" নাম লেখান, নাম লেখান, বিশাল বড় রাবার স্ট্যাম্পের সাইজের চেয়ারম্যানের মাথা, মাওয়ের মাথা। গ্যানমাতে ফিডেল কি বলেছে জানো? আরে মারিখেলার ব্যাপারটা কিন্তু খুব গোলমেলে। আমি চুপ করে থাকি। জানি আমার একটা বিকট গোলমাল হয়ে আছে।

ছোটবেলা থেকে বোধহয় পুরুষানুক্রমিক রক্তের ধারায় থেকে গেছে এই গোলমালের বীজ। বিকট দৃষ্টিভোগের এক ইন্দ্রিয় সুখ আমার যুক্তি বুদ্ধি কিম্বা শব্দ শৃংখল ছারখার করে দিতে চায়। আশ্চর্য সব দৃশ্যমালা, ইমেজ কিম্বা চিত্রকল্প আমার শরীর আর মনের ওপর সর্বব্যাপী যে প্রভুত্ব বিস্তার করে আছে, সময়ে তা সারে না— সেই আমার আজন্ম অসুখ। কবে দেখেছিলাম আশ্চর্য রূপসী আমার দেবীপ্রতিমা, শ্বেতশুভ্র, ভীষণ ফর্সা পায়ের নীলচে শিরা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতন ওঠানামা করছে। কিম্বা এক মহিষাসুরমর্দিনী, কালো গ্রানাইটের খোদাই কিম্বা ব্রোঞ্জের মূর্তি। নীচে সবুজ শ্যাওলাধরা ছাদ আর অনেক ওপরের আকাশে শাদা পাখীর ঝাঁক ঘরে ফিরে যাচ্ছে। নিবু নিবু আলোয় ঝলসে ওঠা ডালিম রঙা নাকছাবির সর্বনাশা ঝিলিক। ঈষৎ স্ফীত তীক্ষ্ম নাকের পাটা কিম্বা বিশাল কান, উল্টনো খণ্ডতর মতন পুরু আর ভারী আর লতিয়ে ওঠা একগুচ্ছ চুলের গোড়ায় মুক্তোর মতন টলটলে একবিন্দু জল। আমার ছুটে যেতে ইচ্ছে করে, অদৃশ্য পায়ের ওপর মুখ রেখে হু হু করে কান্নার অলৌকিক আকাঙ্ক্ষা ভয়ানক হয়ে ওঠে। তেমনি গায়ে কাঁটা দেয় স্মৃতিতে আঁকা কিম্বা ছবিতে দেখা কোন নিসর্গ দৃশ্য কিম্বা জলোচ্ছ্বাস। হঠাৎ মনে পড়ে যায় ওই জলোচ্ছ্বাসের মতন ভেঙে গাড়িয়ে পড়া আমার রূপসী সরস্বতীর অলৌকিক হাসি। সবুজ ঘন জঙ্গলের গা ছমছম দৃশ্য কেন মনে করিয়ে দেয় ছোটবেলার সবুজ শ্যাওলা ধরা ছাদ কিম্বা ছাদের সেই মালীকনের গা ছমছম শাসনের সান্নিধ্য, আদরের শাসন কিম্বা শাসনের প্রতারণা? তেমনি কোন ভীষণ নাড়া দেওয়া ফিল্ম বা চিত্রকলা অথবা গল্পকবিতার শব্দ বা অর্থ আমার মগজে ঢোকে না কস্মিনকালে। যা আমার মনের ভেতর গেঁথে থাকে, আমাকে জ্বালিয়ে মারে তা হল ওই ছবি কিম্বা গল্পকবিতা থেকে উঠে আসা বিশেষ বিশেষ আশ্চর্য সব দৃশ্যমালা— মনে হয় এক্ষুনি ঘটে যাচ্ছে সব— তার অলৌকিক দৃষ্টিভোগের ইন্দ্রিয় সুখের আমি ক্রীতদাস হয়ে থাকি আজন্ম-আমৃত্যু।

মিতা আমার কলার ধরে টানে— এই কি হল ঘুমোচ্ছ নাকি? আসলে আমি মোটেই ঘুমোইনি কিন্তু পুরনো কলেজবাড়ীর পরিত্যক্ত ক্লাশরুমের বেঞ্চিতে মিতার কোলে মাথা রেখে ঘুমের ভান করতে আমার দারুণ লাগে। আমার মাথার চুল টেনে দেয় আস্তে আস্তে। আমার মুখ ঘন হয়ে ডুবে যায় ওর কোলের ভেতর বিশেষ করে যেদিন সিল্কের শাড়ী পরে থাকে— রেশমের একটা একটা আলাদা ওম আছে। আমার একটা হাত, ভরা গড়ানো কলসীর মতন ওর নিতম্ব ছুঁয়ে থাকে। কিন্তু শুধু এই পর্যন্তই। কোনদিন ঠোঁটে ঠোঁট মেলাতে দেয়নি— আর আদর করেনি। কতদিন কবিতা মুখস্থ করে বলেছিলাম "স্তন তার করুণ শঙ্খের মতন" কিন্তু ছুঁয়ে দেখবার পারমিশন পর্যন্ত দেয়নি। রেশমের আলগা গরমে মুখ ঘষতে ঘষতে শিউরে উঠতে হয়। ছোটবেলায় সিল্কের জামা নিয়ে অমনি খেলা খেলতাম, সিল্কে আচমকা নখের ঘষায় কেমন শিহরণ লাগে না? (গঁটে থাকলে অবশ্য বলত স্ট্যাটিক ইলেকট্রিসিটি।) তবু

সেই শিউরে ওঠার মধ্যে অজানা আতংকের কল্পনাও ছিল। কখনো কখনো মনে হত নাঃ শুধু সিল্কের শাড়ী নয় আসলে ভেলভেট। অমনি বিদ্যুৎচমকানির মতন মনে পড়ে যেত ভেলভেটের মতন সেই অলৌকিক পেটের খাঁজে আমার নাক ছঁয়ে আছে— দিদিমণির কোলের ভেতর আমার মুখ। একটা হাতে আমার কান মুলে ধরে আছে আর ছোটহাতা জামার ভেতর দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠছে শান্তিরত হাতের বাহুমূলের অন্ধকার রেশমী কোমলতা। আমি ছিটকে পড়ে যাই মিতার কোল থেকে। মিতা চমকায় আর ধমক লাগায় "উঃ কি সব সীন কর না। অন্যমনস্কতা কি তোমার বিলাস।"

সুধীরদা বলত, "না না ইমেজ না থাকলে মানুষ বাঁচে কি করে? এর ভেতরে মার্কসবাদবিরোধী কোন ব্যাপারই নেই। ভেবে দেখ মার্কসবাদ কিম্বা বিপ্লব— যুক্তি-বুদ্ধি পরম্পরায় গড়ে ওঠা মডেল— কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত তার মূর্তি জীবন্ত হয়ে উঠছে জনগণের প্রত্যক্ষ পার্টিসিপেশনে ততক্ষণ পর্যন্ত ইতিহাসের গতিতে তার দাগ থেকে যেতে পারে না। ভেবে দেখ— অ-এ অজগর আসছে তেড়ে,' আমটি আমি খাব পেড়ে। শিশুর কাছে 'অ আ' তো হরিবল্‌লি এ্যাবসার্ড কনসেপ্ট। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার শরীরী একটা চেহারা ফুটে উঠছে আর সেই শরীরী চেহারার ভেতর থেকে, ক্রমাগত সেই ইমেজ চর্চার ভেতর দিয়ে তার এসেন্স নিংড়ে নেওয়া যাচ্ছে··· । চীনের পার্টি একটা সুন্দর উপমা দিয়েছে আমাদের জন্যে— জান তো। ভারতের আকাশে বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ। দেখ, 'আকাশ', 'বসন্ত', 'বজ্রপাত' এগুলো তো চিরন্তন সব ইমেজ— কিন্তু ওই ইমেজ ছাড়া কি এত স্পষ্ট হয়ে উঠত আমাদের এই সময়?"

আমি বোকার মতন চেয়ে থাকি। আধো অন্ধকারে মিতার ফিসফিস গলা শোনা যায় তারা আসছে একটা—শেষরাতের আকাশে, অনেক বছরের পর। আমি স্বপ্নে দেখি সেই জ্বলজ্বলে অলৌকিক তারা। আকাশে বসন্ত নির্ঘোষের পর আরো উজ্জ্বল, আরো প্রখর হয়ে উঠছে সেই তারা। আর সেই তারার দিকনির্দেশ অনুযায়ী, তারার দিকে লক্ষ্য রেখে অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছে অনেক মানুষ— নির্জন মরুভূমি কিম্বা বরফের পাহাড় পেরিয়ে একা একা তারা হেঁটে আসছে, হেঁটে আসছে।

চার। ভূমিকম্পের আগে

পিঁপড়েরা কি করে যেন টের পেয়ে যায় বিশাল একটা ওলোটপালট ঘটতে চলেছে মাটির গর্ভে, তাই তারা পিলপিল করে বেরিয়ে আসে— লক্ষ লক্ষ। চীনে তো অনেক-দিনের রীতি আছে বাড়ীতে মাগুর মাছ পোষা আর পোষা মাছের ছটফটানি লক্ষ্য করা। আটচল্লিশ ঘণ্টা আগে থেকেই নাকি অস্বাভাবিক ছটফটানি শুরু হয় তাদের। আসামের বিখ্যাত ভূমিকম্পের আগেও নাকি, অনেকেই লক্ষ্য করেছে, পোষা কুকুর বেড়ালের আচার আচরণ বদলে যায় আচমকা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগে এই শারীরিক

বিপর্যয়ের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে কিনা জানা যায়নি। অন্তত নতুন তারার পুনরাগমনে এইরকম বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে কিনা তারো কোন ব্যাখ্যা নেই। অনেক-দিন বাদে প্রায় সমুদ্রের হাওয়ার মতন লেকের হাওয়ায় উথালপাথাল, ওই লেকতীরবর্তী অনেক উঁচু মিনারের মত ফ্ল্যাটে শরীর জুড়োতে জুড়োতে সুরক্ষিত চায়ে চুমুক দিতে দিতে বাসুদেব কিম্বা গৌতমের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলাপ করতে করতে কেমন মৌতাত অনুভব করেছি। জিওলজিস্ট হিসেবে দুজনেরই নামধাম প্রায়ই দেখতে পাই এখানে সেখানে— বাল্যবন্ধু হিসেবে গর্ব হবার মতন। কিন্তু তবুও অন্ধকার নেমে এলে, আমুদে, নিরাপদ, লোকজমজমাট রাস্তা দিয়ে লেকের হাওয়া খেতে খেতে ট্যাক্সি করে বাড়ী ফিরতে ফিরতে সূক্ষ্ম একটা আতংক গায়ে কাঁটা ধরিয়ে দেয় কেন? একদা নির্জন, গা ছমছমে লেকের পাড়া তো এখন বেজায় জমজমাট। সামান্য আইসক্রীম খাওয়ার জন্যেও ফুলের মেলা বসে গেছে যেন, ক্রিমসন রঙের স্কার্টপরা আইসক্রীম চোষা মেয়েটার মুখ ভ্যাঙচানোও কি সুন্দর। সালোয়ার কুর্তা কিম্বা জিন্‌স পরা কিশোরী বালিকার ভিড়ে শাড়ী পরা হঠাৎ গম্ভীর মেয়েটাকে ভারী বেমানান লাগে। ভাবতে অবাক লাগে, আমাদের সময়ে বোধহয় এক পার্সেন্ট মেয়ে সালোয়ার কুর্তা কিম্বা জিন্‌স পরত আর ওই সংখ্যালঘু সুন্দরীদেরই সবাই ফ্যাল ফ্যাল করে দেখত। আর আজ? এক পার্সেন্টও শাড়ী পরে কিনা সন্দেহ। আর তাদেরই অবাক হয়ে দেখে সবাই। ওই তো মেফেয়ার রেস্তোরাঁ, চীনে খাবারের মশলার চাটনী চাটনী গন্ধ নাকে আসছে আর বাইরের শোকেসে, এ্যাকোয়ারিয়ামে জলের তলায় অরণ্যদেবের বিকট বাহু উঠছে আর নামছে আর তালে তালে তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ছে ক্রমাগত। কিন্তু তবু কেন শিউরে শিউরে উঠি, বেজায় শীতে এখনো কেন কপালে ফুটে ওঠে বিন্দু বিন্দু জলরেখা, বিশেষ করে যখন, আজকে যেখানে মুক্তমঞ্চ, তার পাশ দিয়ে ছুটে যেতে যেতে। ওখানেই তো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল তিমিরের শরীর। অষ্টমীর রাতে ভ্যান থেকে নামিয়ে রাস্তার ধারেই মুক্তি দেওয়া হয়েছিল তাকে। ভ্যানটা টাটা করে পেছন ফিরতেই একঝাঁক অন্ধকার কানামাছির মতন তার চোখ লেপ্টে ধরেছিল, বুকের কোণে একখামচে যন্ত্রণার তীব্র ছটফটানি আর মুখ দিয়ে অনেক রক্ত। পোস্টমর্টেম রিপোর্টে জানা গিয়েছিল মৃগী রোগ ছিল নাকি অনেক পুরনো— তার থেকেই··· সেরিব্রাল সিজার! কিম্বা যেখানে ফুলের মেলা বসে গেছে আইসক্রীম বাক্স ঘিরে, প্রণবকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখনো তার আঠেরো পেরোয়নি তাই সতেরোটা পেরেক ঠুকে যীশুখ্রীষ্ট বানানো হয়েছিল তাকে। এবার অবশ্য পোস্টমর্টেমে মৃগী পাওয়া যায়নি। যাবে কি করে? মৃগীতে তো আর পেরেক পাওয়া যায় না খুঁজিতে। এনকাউন্টার, আতংক, অত্যাচার বিজ্ঞান , রক্ত আর বসা ··। মিতা একদিন করুণ গলায় বলেছিল— "জানো, আজ থেকে বছরখানেক বাদে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় দেখবে, অনেক পাগল ঘুরছে যাদের বয়েস তিরিশের কাছাকাছি। জানো, ওদের নাকি নিয়মিত সিরিঞ্জ দিয়ে রক্ত টেনে

নেওয়া হচ্ছে শরীর থেকে। সব জেলেই এসব হচ্ছে।" বলতে বলতে ছলছল করে ওঠে চোখ। (আমি তখনো জানতাম না, ওর মেজদার বন্ধু, যার সাথে মিতার বিয়ে প্রায় পাকা হয়ে উঠেছিল ওই রক্তাল্পতাতেই শেষ পর্যন্ত মারা যায় ছাড়া পাবার ক মাসের মধ্যেই।) বলতে বলতে সত্যিই ওর হাত-পা বোধহয় হিম হয়ে যেত। ওর বিবর্ণ মুখে ফুটে উঠত ভয়। "দেখ, দেখ আমার হাতটা কি ঠাণ্ডা।" সেই প্রথম ওর হাত ধরা। আরেকদিন, জমাট শীত পড়েছিল সেবার। আমিও হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম "দেখ, দেখ আমার হাতটা আরো ঠাণ্ডা।" ও সাগ্রহে আমার হাত দু-হাত দিয়ে চেপে জড়িয়ে ধরেছিল।

কেন জানিনা ওর দীপ্ত মুখে যেন হাজার পাওয়ারের আলো জ্বলে উঠেছিল, সেই মাত্র একবারের জন্যেই বোধহয় আমি 'পরিপূর্ণতা' অনুভব করেছিলাম।

কিন্তু আমি কেন আজন্ম শূন্যতার অসুখে ভুগে আসছি? আমার তো কোন বিকট অভাব ছিল না খাওয়া পরার, বা সাধ-আহ্লাদের? (সুধীরদা বার বার মনে করিয়ে দিত। "মনে রাখিস আমরা পার্টিতে পেটের জ্বালায় আসিনি এসেছি বুদ্ধির জ্বালায়। আসলে আমাদের মতন কমরেডদের দায়িত্ব অনেক।") তবু আজীবন এক শূন্য থেকে আরেক শূন্যে আমার লাফিয়ে চলা। কখনো কখনো শূন্যে থাকে না— ভরে ওঠে প্রবল আতংকে, যেন ওই আতংকই দূরে করে দিতে পারে সব শূন্যতা। কতদিন বাদেও রক্তের মধ্যে বয়ে চলে আমার আজন্ম ভয়ের শিহরণ— অজানা, অবাস্তব তবু অসম্ভবের ভয়। কতদিন আমার ঘরে কোন পুরনো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে যাবার পর বন্ধুকে পাড়ার ট্যাক্সিতেই তুলে দিয়েছি— তবু হেঁটে হেঁটে পাড়ার ভেতর দিয়ে বাড়ী ফেরবার সময়ে অসম্ভবের আতংকে শিউরে উঠেছি— বোধহয় ফেরার পথেই ট্যাক্সি সমেত লোপাট হয়ে যাবে বন্ধু। ভাঙাচোরা এক স্তূপের মধ্যে গেঁথে থাকবে তার বিকৃত শরীর— আর উল্টে আমাকেই ধরে নিয়ে যাবে খুনের ষড়যন্ত্রের জন্যে। স্বপ্নে দেখি, আমার সব চুল সাদা হয়ে গেছে টলস্টয়ের গল্পের মতন— যাকে আঠারো বছর দুঃসহ কারাবাসে কাটাতে হয়েছিল, কেননা খুন করার পর, সরাইখানায় খুনীর রক্তাক্ত ছুরিটা বদমায়েশী করে তার ব্যাগে পুরে দেওয়া হয়েছিল। মিতার বিমর্ষ ঠোঁট আধো অন্ধকারে ফিসফিস করে ওঠে "চল আমরা পালিয়ে যাই। অনেক দূরে। কানাডায়। দাদার বন্ধুরা কেউ কেউ ওখানে সেটল্ করেছে। বিপ্লব কি শুধু দেশেই নাকি? ওখানেও অনেক কাজ করবার আছে। ইপানা বলে একটা কি হয়েছে জান? কেন কামগাতামারু থেকে যারা কানাডায় গেছে— সব বিট্রেয়ার নাকি?" আমি হাসতে পারি না, ঠোঁটের লাগামে বিষফোঁড়া উঠেছে একটা দাড়ি কাটতে গিয়ে। সুধীরদা শাসায়, "খুব সাবধান। ডোন্ট এক্সপোজ ইয়োরসেল্ফ। তোকেই গ্রামে যেতে হবে। শহরের এ্যানার্কি তোমার জন্য নয়। অল্পস্বল্প কুরিয়ারের কাজ করতে পার, কিন্তু ওই পর্যন্তই। মাছ যেমন জলের মধ্যে মিশে থাকে তেমনি তোমাকেও মিশে থাকতে হবে জনগণের ভেতর। মনে রাখবে রাইফেল যদিও শক্তির উৎস আসলে জনগণই মহান,

সর্বশক্তিমান যা তোমাকে লুকিয়ে রাখবে— ধরতে ছুঁতে পারবে না কেউ।"

আমার অস্বস্তি লাগে। এইজন্য শুধু নয় যে এইসব আশ্চর্য শব্দমালা, বোধ-বুদ্ধি বা ইতিহাসচেতনার পরাকাষ্ঠা এই শব্দের জাদু আমার মনের গভীরে কোন ঝংকার তোলে না (অথচ প্রণবরা প্রবল আনন্দ পায় এই শব্দসমৃদ্ধির, মতাদর্শের তক্কোবাজীতে, গুঁটে বলে এক ধরনের 'ওর‍্যাল সেক্স') এইজন্যেও বটে যে শব্দমালার চাইতেও আশ্চর্য দৃশ্য-মালাতেই আমার বশ্যতাস্বীকার। 'জনগণ মহান সর্বশক্তিমান'— এইসব এ্যাডজেকটিভে আমার রক্তের ভেতরে কেন বেজে ওঠে না সেইরকম ছলাৎ ছলাৎ যা অন্য অন্য লড়াকু জনতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে থাকে দুবেলা ? কেন আমার ইচ্ছে করে 'মহান সর্ব-শক্তিমান' এইসব শব্দের লিঙ্গপরিবর্তনে— মহিয়সী, সর্বশক্তিময়ী এক আশ্চর্য নারীমূর্তি নিবু নিবু আলোয় প্রখর হয়ে ওঠে। অসম্ভব ফর্সা পায়ে নীলচে শিরা নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মতন ওঠানামা করে··· কিম্বা গ্রানাইটের খোদাই কালো পায়ের অদৃশ্য আলতা। ওই পায়ের ওপর মুখ রেখে হু হু করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করে···হায় আমার ভালবাসা, আমার বিপ্লব, আমার দেবী।

পাঁচ। একটি ইস্তেহার অথবা প্রেমপত্রের খসড়া

শোন মিতা, আমার প্রথম এবং শেষ প্রেমপত্র, যা কোনদিন লেখা হয়নি, তোমাকে শোনাতেই হবে। এই আমার এক অসুখ, শয়নে স্বপনে আমাকে উত্যক্ত করে মারে, যেন তোমাকে না শোনাতে পারলে শরীরের ভেতরের এই তীব্র অসুখ কোনদিন সারতে পারবে না। জানি তুমি খুব বোর হবে, প্রায় আমারি মতন— কিন্তু উপায় নেই, রঘু আর বিনয় নামে দুজন লেখা শিকারী আমাকে ঘাড়ে ধরে কবুল করিয়ে নিয়েছে। কিছুতেই পরিত্রাণ নেই, কাগজ ভরাট না হলে— কেননা এক ফর্মা বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়নি অথচ কাগজ কেনা হয়ে গেছে অতএব ভরাট না হলে আমার মুক্তি নেই।

তাহলে শোন মিতা, সবাই জানে বিপ্লবের জন্য, গ্রামে যাওয়ার জন্য আমি তোমার সব সম্পর্ক ছেদ করে ছুটে চলে গিয়েছিলাম অলংঘণীয় অজ্ঞাতবাসে।

কিন্তু তুমি তার চেয়েও ভাল জান যে একজন ম্যাজোকিস্ট এবং বেসিক্যালি একজন ইমপোটেন্ট-এর সঙ্গে কুমীরডাঙ্গা, স্ট্যাচু-স্ট্যাচু কিম্বা বড়জোর ঘোড়াঘোড়াও খেলা যায় খুব বড়জোর এক বছর কিন্তু তারপর চকলেটের পরিত্যক্ত বাক্স কিম্বা ব্যবহৃত লিপস্টিকের বর্জনীয় পরিশিষ্টের বেশী কিছু অবশিষ্ট থাকে কি ? তাছাড়া তোমার দাদারা ততদিনে, গনগনে আগুন নিয়ে খেলার শেষে (যদিও এরা আমার খুবই শ্রদ্ধেয়—বিশেষত মেজদার সেই বন্ধু যিনি ছাড়া পাবার কিছু পরেই রক্তাল্পতায় মারা গেলেন) কানাডায় সেট্‌ল করতে ব্যস্ত। এবং সন্দীপকে দিয়ে তুমিই আসলে খবর পাঠিয়েছিলে— ও তারা তারা চোখে বলেছিল "জানিস দারুণ খবর আছে একটা। আমি জানি না কিভাবে তুই

নিবি— ভাবা যায় না···মানে আমাদের মিতা···না না বিয়ে কিনা জানি না তবে কানাডায় যাচ্ছে হয়তো পি এইচ ডি করতে।" তোমার ভিসার জন্য এত ব্যস্ততা ছিল যে আমার সঙ্গে দেখা করবার অবকাশ হয়নি তাই বিলায়েৎ খাঁর দরবারী কানাড়ার এল পি রেকর্ডটা, যা আমার কাছ থেকে অনেকদিন হল কেড়ে নিয়েছিলে গভীর রাতে শুনবে বলে সেটাও সন্দীপের হাত দিয়েই ফেরত পাঠিয়েছিলে। আমার মুড়ির টিনের মতন রেলগাড়ীটা যখন অত্যন্ত অজ একটা ফ্ল্যাগ স্টেশনে আমাকে একা একা নামিয়ে দিয়ে চলে গেল এবং আমার নতুন হোস্ট নিবারণদা যখন স্টেশন থেকে আমাকে আমার মালপত্রশুদ্ধ সাইকেল রিক্সাতে চাপিয়ে দিল তখন কেন জানি না বিমল করের 'শূন্য' বলে গল্পটা মনে পড়ছিল। আমার স্মৃতি-স্বপ্নের পরম্পরায় একটা অংশ কি কেউ চাকলা করে কেটে ফেলে দিল? তাই তোমার জন্য কোন কষ্ট, যন্ত্রণা এসব কখনো উঁকি দেয়নি। বরং আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম এক ধূ ধূ প্রান্তরের নিস্তব্ধতায়। কতদূরে ধানের আলের বরুরেখা আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। ভাবা যায় এইখানেই আশীভাগ জনগণের চারণভূমি? (আশী না নব্বই এইসব নিয়ে অনেক তর্ক যা যা শুনেছিলাম সব যেন হু হু হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সংখ্যা নিয়ে গোলযোগের ব্যাপারে সন্দীপ মজা করে বলত—এটা বোধহয় সেই 'আমরা বাঙালী' আর 'বাঙালী আমরা'-র ঝগড়ার মতন। এ বলত 'নব্বই ভাগ বাঙালীর চাকরী চাই' ও বলত 'একশ ভাগ বাঙালীর'— তার মানে অবশ্য একশ ভাগ খাঁটি বাঙালী আর মিশেল দেওয়া নব্বই ভাগ দোআঁশলা বাঙালীও হতে পারে।)।

নিস্তব্ধতার যে একটা আশ্চর্য শব্দ আছে সেটা গ্রামে না গেলে বুঝতে পারতাম না। অনেকক্ষণ কানপেতে থাকলে শোনা যাবে সেই শব্দ— একটা অদ্ভুত গমগমে নিস্তব্ধতার আওয়াজ। এতই সর্বব্যাপী অশ্রুত সেই গমগম নিস্তব্ধতা যে কিছুক্ষণ পরে যদি হঠাৎ কোন পাখী ডেকে ওঠে কিম্বা শুরু হয় ঝিঁঝিঁর ঐকতান তাহলে সেই আওয়াজ শোনা যায় হঠাৎ বেজে ওঠা তীক্ষ্ণ কোন যন্ত্রসঙ্গীতের ভাঙা টুকরোর মতন।

অনেক মানুষের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিল নিবারণদা··· মেহনতী মানুষ যদিও লড়াকু জনতা, সংগ্রামী জনগণ তখনো হয়নি (কিন্তু হওয়ানোর জন্যই তো আমাদের পাঠানো)। তাদের অভাব অভিযোগ দৈনন্দিন দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে কোথায় গঁজে দেওয়া যায় সেই টাইমবোমা, ঠিক সময়ে যার বিস্ফোরণ তুলকালাম করে দিতে পারে এই অন্ধসমাজের অস্তিত্বে?

শহরের খবর আসত অনেকদিন বাদে বাদে, সাধারণ নিশুতি রাতে, বাজারের থলিতে করে পার্টির নিষিদ্ধ কাগজ সমেত।

শহরে ততদিনে গা-সওয়া হয়ে গেছে নর্দমায় ভাসা লাশ। হাজতবন্দীদের কলজে-ফাটা চিৎকারে (চারহাতপায়ে উপুড় করে শুইয়ে, হাত আর পায়ের পাতার ওপর ভারী বর্মাটিক টেবিলের চারপায়া চাপিয়ে টেবিলের ওপর নাকি নৃত্য করত সেপাইরা) রাত্তিরে অনেক পাড়াতেই ঘুম হত না। এই সময়েই ঘরকুনো অনেক বাঙালীই দলে দলে

বাইরে যেতে বাধ্য হয়। ড্রপ আউটরা শুধু মেস্‌রা, পিশানী বা শিমলাতেই নয় ইউরোপ, এ্যামেরিকার ইউনিভার্সিটিতেও ভীড় জমায় (কে না জানে তাজমহলের জন্য আগ্রা আর আই. কিউ.-র জন্য কলকাতা বিখ্যাত)। এসব খবর নিশ্চয়ই তোমরা বি. বি. সি. মারফৎ শুনতে (তখন ভাগ্যিস সি. এন. এন. আসেনি)।

কুম্বিং অর্থাৎ চিরুনীওয়ালী চালিয়ে গোরু ভ্যাড়ার মতন যখন তখন বারো থেকে পঁয়ত্রিশদের পাইকারী হারে তখন তুলে নেওয়া হচ্ছে। যন্ত্রণাবিজ্ঞানের খুব বাড়বাড়ন্ত তখন। এইসব খবর আসত খুব ভাসাভাসা, পাছে আমাদের ম্র্যাল ভেঙে যায়। নিবারণদা প্রায়ই খোঁচাত। আমাকে নাকি বড্ড ভালবেসে ফেলেছে গাঁয়ের মানুষজন। শুধু প্রাইমারী স্কুল আর বয়স্ক শিক্ষার মাস্টার হিসেবেই নয় বিপদে আপদে শলাপরামর্শ নিতেও ডাকতে আসে রাতবিরেতে। এইতো সুযোগ মানুষের দৈনন্দিন অসন্তোষের বারুদে দেশলাইকাঠি জেলে দেওয়ার। কিন্তু আমি লক্ষ্য করি না কিছুই। আমার লক্ষ্যে আসে দিনরাতের আশ্চর্য শব্দ পরিবর্তন। নিস্তব্ধতার দ্বিপ্রাহরিক গমগমে শব্দ কখন রাতের নির্জনতার অন্যতর শব্দে বদলে যায়। আর সন্ধ্যের আকাশে কখনো কখনো খুঁজতে ভাল লাগে সেই আশ্চর্য তারা, জ্বলজ্বলে তারা যার খোঁজে তুমি যেতে চেয়েছিলে নির্জন কোন সমুদ্রে অথবা বালিয়াড়িতে।

ধু ধু প্রান্তরের আশ্চর্য নিস্তব্ধতার মতই গাঁয়ের মানুষদের অদ্ভুত মুখে কুলুপ আঁটা নিস্তব্ধতা। শোনা যায় তাদের জমিদার নাকি অন্য গাঁয়ে থাকে। যখন তখন তাদের খাজনা আদায়ের নামে ডেকে পাঠায় আর বিকট প্রহারের কালশিটে সারা শরীরে মেখে তারা ফেরত আসে এ ওর ঘাড়ে করে। কিন্তু প্রতিবাদ করতে সাহস পায় না কেউ। কেন্দ্র থেকে এত্তেলা আসে প্রায় প্রায়ই। আর কত দেরী কত বাকী! চারদিকে আগুন জ্বলছে শুধু নিবারণদার গ্রাম যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, আগুনের রিং-এর মধ্যে নিস্তব্ধ হয়ে থাকার বিকট সার্কাস দেখাচ্ছে।

গভীর রাতে জেগে উঠে বসে থাকি। নিবারণদা গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। অদ্ভুত গল্প শোনায় একটা যা ওর বাপ ঠাকুর্দার আমল থেকে শুনে এসেছে বংশ-পরম্পরায়। তখন ভারী জঙ্গল ছিল এই দিকটায়। দিনের বেলাতেও বাঘ বেরুত। অনেক দিনের কথা সেসব। কোম্পানীর আমলটামল হবে। ইংরেজদের সঙ্গে কি একটা ভীষণ লড়াই তখন লাগো লাগো। এমনি একদিন জঙ্গলে খেলতে খেলতে নিবারণদার ঠাকুর্দার বাবা (অথবা ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা) রাস্তা হারিয়ে ফেলে। ওঁদিকে সন্ধ্যে প্রায় হয় হয়। গাছের পাতায় পাতায় গা-ছমছমে শিরশিরে হাওয়ার শব্দে কান্না পেয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ জঙ্গলের মাঝখানে একটা পরিষ্কার মতন জায়গায় খানিকটা উঁচু চাতালের পেছনে উঁকি মেরে বসে একটা বহুদিনের পুরনো জীর্ণ কুঠি, আর কি আশ্চর্য তাতে গ্যাসবাতি জ্বলছে ভেতরে। পুরনো ভারী পর্দার ঘোমটা হাওয়ায় উঠে উঠে একঝলকে দেখিয়ে দিচ্ছে ভেতরকার ভারী পুরনো কাঠের আসবাবপত্র আর জৌলুশ। ছেলেটা (অর্থাৎ

ঠাকুন্দা) এক দৌড়ে চাতাল পেরিয়ে ভেতরের বৈঠকখানায় ঢুকতেই অবাক। একটা হলঘরের মতন বিশাল জায়গা, কেমন দরবার দরবার ঢঙে সাজানো। পুরনো গালচে সিঁড়ি থেকে পাতা সোজা চলে গেছে ঘরের শেষপ্রান্তে উঁচু মতন একটা সিংহাসনের তলায়। সিংহাসনের ওপর ঘর আলো করে বসে আছে মুকুটপরা বনের রানী। রং যেন দুধে-আলতার মতন, আলতাপরা পা এত ফর্সা যে ভেতরের নীল শিরা পর্যন্ত স্বচ্ছ জলের ভেতরকার মাছের খেলার মতন দেখা যায়। প্রতিমার মতন ভরাট লম্বাটে মুখ ভারী সুন্দর, তীক্ষ্ণ নাক, বিশাল কান— তাতে নীল হীরের দুল ঝলসে ঝলসে ওঠে। কিন্তু চোখ দুটোই যা ভয়ংকর— এত নির্মম ক্রূর দৃষ্টি হতে পারে কারোর··· । কুচকুচে দুটো ভুরু মর্মান্তিক কোন শাস্তির ইঙ্গিতে কুঁচকে কুঁচকে উঠছে। বাঘের ছালের শাড়ীর ভেতর দিয়ে আগুনের শিখার মতন শরীর দেখা যাচ্ছে। আরেকটা বাঘের ছালের ওপর দু-পা আর দু-পাশে বাঘের মতই দুটো ডালকুত্তা— তাদের ঝোলা জিভ আর লালা গড়ানো হিংস্র মুখ ভীষণ হয়ে উঠছে। অন্ধকারে নিবারণদার ফিসফিসে গলা জড়িয়ে জড়িয়ে আসে আর স্পষ্ট দেখতে পাই যেন আমিই নিবারণদার সেই ঠাকুন্দার ঠাকুন্দা, পুরনো গালচের ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে কোন অলঙ্ঘ্য নির্দেশে ওই বনবিবির পায়ের কাছে এসে পড়েছি! হিংস্র বাঘের মতন ডালকুত্তার দুটো থাবা উদ্যত হয়ে উঠতেই বনবিবির প্রচণ্ড ধমক লাগায় আর কুত্তা দুটো ঘেউ করে উঠেই থমকে যায়। বাজ পড়ার মতন চিৎকার শোনা গেল একটা "সাহস বড় কম নয় তো! এখানে আমার শাস্তি কি জানিস?" বলতে বলতে আমার গায়ে গরম গরম লালাঝরানো নিঃশ্বাস পড়ে ডালকুত্তা দুটোর। বনবিবির পায়ের তলায় হাঁটুগেড়ে বসা আমার শরীর। দারুণ আতঙ্কে চোখ বুজতেই হুকুম শোনা যায় 'চোখ খোল'। চোখ খুলতেই গা শিউরে ওঠে — বনবিবির হাতে লকলক করে উঠছে বিশাল সাপের মতন প্যাঁচানো চাবুক, তার মুখটা সাপের ফণা ধরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে। আবার আতঙ্কে চোখ বুজতেই আকাশ ফাটানো হাসি শোনা যায়।

আসলে আমার ওপর খুব দয়া হয়েছিল বনবিবির। তাই অবাধ্যতা করলে কি পরিণাম হতে পারে তার অভিনয় দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়েছিল! আর কিছু বলেনি। একবছর বনবিবির অকপট দাসত্ব স্বীকার করে নিলে শেষ পর্যন্ত বাড়ী ফেরার বন্দোবস্ত করে দেবে এইরকম শর্ত মেনে নিতে হয়েছিল অবশেষে। আর প্রথমদিনই ভয়ংকর শাসানি দিয়ে রেখেছিল ভুলেও যেন দরবারের পাশের তালাবন্ধ ঘরটার চাবির ফুটো দিয়ে কিছু দেখতে না চাই। দেখলেই ভয়ংকর বিপদ।

আমার রাজসিক খাওয়া পরার কোন অভাব রাখেনি জঙ্গলের রানী। দিনেরবেলায় প্রায় দেখাই হত না কেননা মাঝদুপুরের আগে রানীর ঘুম ভাঙত না। কিন্তু দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে এলেই শুরু হয়ে যেত সাজগোজ পর্ব। ভীষণ কেতাদুরস্ত না হয়ে থাকলে বেজায় বিরক্ত হত রানী। রাত্তিরের ডিনার হত, এক টেবিলে আমি আর রানী আর

পায়ের কাছে দুটো ডালকুত্তা। কিন্তু আমি ঠিক জানতাম পাশের ঘরের রহস্য আমাকে ভাঙতেই হবে, ভাঙতেই হবে। তারপর একদিন নিশুতি রাতে আমার ঘরের তালাবন্ধ করতে সেদিন ভুলে গেছে, পা টিপে টিপে হাজির হই দরবার হলে, চোখ রাখি পাশের দরজায় চাবির ফুটোয়। দেখি এক বিকট দৃশ্য। দেয়ালের আংটায় আংটায় মশাল জ্বলছে অনেক। ঘরের একপাশে সারসার পাথরের মূর্তি। আগুনরঙা জামায় বনবিবিকে দেখাচ্ছে লকলকে শিখার মতন। তার এক হাতে ধরা বিশাল সাপের ফণাওয়ালা সেই চাবুক নির্মম গতিতে আছড়ে আছড়ে পড়ছে ওই মূর্তিগুলোর পিঠে, বুকে, সারাশরীরে, একটা অস্পষ্ট কান্নার আওয়াজ ঘুঘু পাখীর গুমরে ওঠার মতন, মুচড়ে মুচড়ে উঠছে। ডালকুত্তা দুটো মুখে কামড়ে ডজন ডজন চাবুক এনে রানীর পায়ের কাছে ফেলছে আর ভয়ংকর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে শ্লিক্ শ্লিক্ শ্লিক্ আর ততই বীভৎস হয়ে উঠছে রানীর হিংস্র দৃষ্টি। সব শেষ হয়ে এলে ঘরের একপাশের পর্দা ঠেলে দেয় রানী। সেখানে গোপন দেরাজ থেকে বেরিয়ে আসে একটা সোনার কৌটো। কৌটো খুলতেই একটা রঙীন প্রজাপতি গুনগুন করতে করতে রানীর খোঁপায় এসে বসে। কৌটোর একটা ডালায় ছোট্ট আয়না···সেখানে ফুটে উঠেছে অনুপম এক সদ্যকিশোরী মুখ, সেখানে কোন পাপ নেই, হিংসা নেই, নিষ্ঠুরতা নেই। অনেকক্ষণ প্রসাধন করে রানী মন দিয়ে তারপরই গুনগুন করতে করতে প্রজাপতিটা ঢুকে পড়ে সোনার কৌটোয়। হঠাৎ একটা নিঃশ্বাস আমার শরীরে পড়তেই বাজ পড়ার মতন আওয়াজ হয়, বন্ধ দরজা বিকট আওয়াজে খুলে যায়। রানীর চোখের নিষ্ঠুর দৃষ্টি হিংস্রতম হয়ে ওঠে আর প্রবল বাজ-পড়ার মধ্যে বুঝতে পারি আমিও একটা পাথুরে মূর্তি হয়ে যাচ্ছি, আমার হাত পা অসাড়, পা দুটো কেউ মেঝের সঙ্গে আটকে দিয়েছে।

অন্ধকারে নিবারণদার গলা আরো জড়িয়ে আসে। বুঝলি ওই মূর্তিগুলি ছিল আসলে রানীর ক্রীতদাস। রানীর চোখের শাসনেই ভয়ে পাথর হয়ে যেত তারা। টিকটিকি যেমন করে সম্মোহিত করে তার শিকার, কেমন পাথর হয়ে যায় টিকটিকির দৃষ্টিতে, আত্মসমর্পণ করে শিকারীর কাছে তেমনি ওই ক্রীতদাসেরাও সম্মোহিত আত্মসমর্পণ করত রানীর চাবুকের কাছে। অথচ ওই রানীটার মৃত্যু ছিল কত সহজ, একেবারে হাতের কাছে ওই দেওয়ালের পর্দার আড়ালে। অথচ কেউ জানত না, জানার চেষ্টাও করেনি— তাই এত আতংক। যা না জানা তাইতো ভয়?

আরো অনেক পরে একদিন ভোরবেলায় একপাল ছেলেমেয়ে কানামাছি খেলতে খেলতে ঢুকে পড়েছিল রানীর ওই গুহায়। খেলতে খেলতে নেহাৎ খেলাচ্ছলেই তারা পর্দায় হাত বাড়ায়। পর্দা খুলে আত্মপ্রকাশ করে সেই দেরাজ আর দেরাজের ভেতর সোনার কৌটো। টানাটানিতে সোনার কৌটো খুলে যায় প্রচণ্ড এক বিস্ফোরণের আওয়াজে, বেরিয়ে আসে সেই প্রজাপতিটা। অমনি বিকট আওয়াজে রানীর ঘুম ভেঙে যায়। বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে দেখা যায় সেই প্রজাপতির পাখা মেলা, ছেলের দলের দৌড়

আর রানীর ক্লান্ত দৌড় পেছন পেছন। যত দৌড়য় ততই হাঁপ ধরে রানীর। বিঁচ্ছির বিকট হয়ে ওঠে তার শরীর। হাড়গোড় বেরিয়ে আত্মপ্রকাশ করে এক লোলচর্ম ডাইনী। অবশেষে এক গুলীতর আঘাতে প্রজাপতিটা ডানা ভেঙে পড়ে যেতেই হুড়মুড় করে মুখ থুবড়ে পড়ে রানী অথবা লোলচর্ম সেই ডাইনী, কোথায় সেই রূপ আর জৌলুশ, বীভৎস হাড়জিড়জিড়ে এক ডাইনীর মৃতদেহে অনেকক্ষণ পড়ে থাকে সেই জঙ্গলের মাটিতে আর সমস্ত পাথরের দল মানুষ হয়ে ঘরে ফেরং আসে।

অন্ধকারে নিবারণদার নাক-ডাকার আওয়াজ শোনা যায়। কিন্তু আমার ঘুম আসে না। পর পর অনেকগুলো বাজ পড়ে যেন আর বিকট বিদ্যুতের ঝিলিকে আমার সেই গোপনতম স্বপ্ন অথবা বাস্তবেরই একটুকরো প্রজাপতির মতন পাখা মেলে আত্মপ্রকাশ করে। কাউকে বলিনি এতদিন··· কাউকে না।

আমার সেটাই ছিল বাল্যকালের শেষ বছর। সামনেই টেস্ট পরীক্ষা তারপরেই হায়ার সেকেন্ডারী (ক্লাস ইলেভেন তখন)। ছাতের ইস্কুলে তখন অপর্ণাদির শাসনের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছে আর সেই সাম্রাজ্যের একনম্বর উপানিবেশ আমি। ফার্স্ট টার্মিনালে বাজে নম্বর হলেও হাফইয়ার্লিতে আমার নম্বর বেজায় ইম্প্রুভ করেছে।

কিন্তু কিছুতেই পড়ায় মন বসে না— অদ্ভুত এক ক্লান্তিতে ছেয়ে থাকে আমার শরীর। সেই ক্লান্তির ভেতরে কোথাও একটুকরো গোপন আতংকের সুখ, বীভৎস সেই সুখ অন্তর্লীন হয়ে থাকে। রোজ সন্ধ্যেবেলা খেলার শেষে আমি আর সন্দীপ মাঠের শেষ প্রান্তের পড়ো দেয়ালটার সামনে হাজির হই। দেয়ালের ফোকর থেকে বেরিয়ে আসে সেই অদ্ভুত ছবির এ্যালবামটা। বোধহয় বিলেত থেকে আনানো— এত সুন্দর তার ঝকঝকে ছবি আর ছাপার কাগজ। ছবি··· ছবি অনেক ছবি। অদ্ভুত সেই মেয়েদের ছবি তাদের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উল্ভট সব ব্যাপার। কোনটায় জামা গায়ে দেওয়া, কোনটায় নেই। যেগুলোর জামা গায়ে দেওয়া সেগুলো আরো মোহময়ী, আরো বিঁচড়। সেই এ্যালবামটা এক সপ্তাহের জন্যে ধার চেয়ে প্যান্টের পকেটের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে এসেছি। কখনো মোটা লাল বাঁধানো স্কলার খাতাটা, কখনো বা বিশাল জ্যামিতি বই-এর ভেতরে তার বাস। নিশুতি রাতেও পড়ার নাম করে টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে বসতে হয় জ্যামিতি বইটা সঙ্গে নিয়ে, সামনে খোলা থাকে আঁক কষার এক্সারসাইজ খাতা। সাদাই থেকে যায় পাতার পর পাতা। দিদিমণি খুশীও হয় আবার বোধহয় সন্দেহের মেঘও জমতে থাকে মনের ভেতরে যার হদিশ পাওয়া যায় না বাইরে থেকে। এত যদি পড়ার ধুম তবে হোমটাস্কের এইসব সিলি মিস্টেক আসে কোথ্থেকে? আমি উত্তর দিতে পারি না। মুখ নীচু করে থাকি, আর অভ্যেসমতন নীলডাউন হয়ে দিদিমণির হাতে কানমলা খাই। আমার পাহারা আরো কড়া হয়। নিশুতি রাতে ঘুম ভেঙে জল খাবার নাম করে স্কলার খাতাটা হাতড়ে নেবো ভাবতে না ভাবতেই চুলের ভেতর হাত বুলিয়ে দেয় দিদিমণির হাত। কখন উঠে এসে লক্ষ্য করছে আমাকে। "কিরে ঘুম হচ্ছে না বুঝি।

এত রাতে আর লেখাপড়া করে শরীর খারাপ করতে হবে না। নে তোর মাথায় একটু আরাম করে দিচ্ছি— ঘুমিয়ে পড়।" আমার খুব অপরাধী-অপরাধী লাগে। পরদিন দুপুরে টেনে ঘুম লাগাই। সারা সকাল বিদঘুটে অংকের হোমটাস্ক করে খাতা জমা দিয়ে দিয়েছি দিদিমণির হাতে। চোখ কচলে উঠতে উঠতে দেখি দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকেল, আলো নিবু নিবু হয়ে আসছে।

সদ্য গা ধোওয়ার পর অপর্ণাদি কেন যে হর্সটেল করে টানটান বেঁধে ফেলে চুল কে জানে। কিন্তু এই শেষ বিকেলের আলোয় কোমল স্নেহবতী মুখ আরো কোমল হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু তার বদলে প্রখর হয়ে উঠছে গ্রীক প্রতিমার মতন লম্বাটে মুখ। কি যেন মাথা মুখে তাতে কালো রঙের মহিমা গলে গলে পড়ছে। কুচকুচে কালো চোখের তারা আর ভুরু প্রখরতম হয়ে উঠতেই মনে হয় কি কঠিন, কি নিষ্ঠুর। হোমটাস্কের খাতাটা ফটাস্ করে আমার বিছানায় ফেলে দিয়ে কঠিন নিঃশ্বাস ফেলে— "এই তোমার হোমটাস্ক।" আমার একটা কান পেঁচিয়ে ধরে আবার প্রচণ্ড সেই নিঃশ্বাস — তাতে জর্দা পানের গন্ধ, লালনীল পেন্সিলের গন্ধ, অদ্ভুত সুন্দর একটা আতরের গন্ধ···। আবার সেই নিজেকে ছালছাড়ানো মুরগির মতন মনে হতে থাকে, একটা অশরীরী অনির্দেশ্য, তীব্রতর যন্ত্রণার মতন— যেমন মনে হয়েছিল অনেক কাল আগে শ্যাওলাধরা সবুজ ছাতের ওপর সরস্বতীর গলা জড়িয়ে ধরে ধরা পড়ে যাওয়ার সময়ে। (কিন্তু সেদিন তো শাস্তি দেয়নি, আদরই করেছিল অবশেষে।) আতংকে শিউরে উঠতে উঠতে আবিষ্কার করি হোমটাস্কের আসল খাতাটার বদলে সেই লাল স্কলার খাতাটা কি করে ভুলে সাবমিট হয়ে গেছে। স্কলার খাতার জামা খুলে বেরিয়ে পড়েছে ছবির এ্যালবাম আর এ্যালবাম জুড়ে খ্যালখ্যাল করে হেসে চলেছে স্বল্পবাস নিষ্ঠুর সেই সুন্দরীর দল। আমার দুর্দশায় হেসে গড়িয়ে পড়ছে তারা, কেউ খুলে ফেলছে জামার বোতাম, কেউ তার নিপুণ বাহু উদ্যত করে— কি ভয়ংকর সেই বাহুমূলে, মসৃণ রেশমের মত তার নিষ্ঠুর কোমলতা— স্বল্পবাস বক্ষবন্ধনীর পেছনের ফিতে খুলতে ব্যস্ত। দেওয়ালজোড়া আয়নার সামনে আমি নীলডাউন হয়ে দেখতে পাই দিদিমণির হাতে লালটুকটুকে একটা লকলকে বেত যা সপাং সপাং করে আমার পিঠে আছড়ে পড়তেই গোটা দেওয়াল আয়না জুড়ে, সাপখেলানো সুরে কিম্বা ডুগডুগির আওয়াজ অথবা পিয়ানোর আশ্চর্য ঝংকারের সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলেছে এ্যালবামের সেই নিষ্ঠুর সুন্দরীর দল। সেদিন আমি সারারাত বিছানায় উপুড় হয়ে কেঁদেছিলাম কিনা মনে নেই। তবে এমনি পাথর হয়েছিলাম যে অপর্ণাদি অনেক অনুনয়বিনয় করেও খাওয়াতে পারেনি। নিশুতি রাতে অনুভব করেছিলাম আমার খাটের পাশে অপর্ণাদি পাথরের দেবীপ্রতিমার মতন বসে, হাত দিয়ে দুচোখ ঢাকা আর অস্পষ্ট ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ, যেন ঘুঘুপাখীর আওয়াজের মতন গুমরে গুমরে উঠছিল। সেই আশ্চর্য দেবী-প্রতিমার পায়ের কাছে বসে আমি কোলে মুখ চেপে দিতেই শিউরে উঠেছিলাম

ভেলভেটের মতন নরম পেটের খাঁজের স্পর্শে, আমার নাকের ভেতর চেপে বসেছিল দুই স্তন, অস্পষ্ট বোতাম খোলার আওয়াজ টের পেয়েছিলাম। কি প্রবল প্রভুত্বপরায়ণ, কি অসম্ভব মোহময়ী সেই স্তন। আমার ভেতরটা মুচড়ে মুচড়ে গলে গলে পড়ছিল প্রবল নিষ্পেষণে— যেন বিশাল এক জলপ্রপাত আছড়ে আছড়ে পড়ছে পাথরের মতন — প্রচণ্ড সেই প্রপাতে পাথর কেটে কেটে ভেঙে পড়ছে— যেন প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস, ঝড় উঠেছে ভীষণ। সত্যিই প্রবল ঝড় এসেছিল। জানলা ভেঙে পর্দা খুলে একাকার। আমি চোখ কচলে নিবারণদাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে দিয়েছিলাম কেননা বাইরে প্রবল ঝড় উপেক্ষা করে আকাশের গায়ে গায়ে মশাল জ্বলে উঠেছে— অনেক আশ্চর্য তারা কি করে উঠল ঝড়ের রাতে? আসলে তারা নয় মানুষ, অনেক মানুষ যাদের যুগযুগান্তরের ক্রোধ মশাল হয়ে জ্বলে উঠছে। তাহলে কি সত্যিই বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। বাইরে বাজ পড়ার আওয়াজ। জল আর বন্যা··· আর মানুষের বন্যা। সত্যিই জেগে উঠছে ঘুম পাড়ানী গ্রাম।

ফলে অনেক রক্তের বন্যা বয়ে যায়। অনেক লাশ। অনেক ঘাম কান্না আর রক্ত। এসব তো তোমরা খবরের কাগজে দেখেছ। কিম্বা এ্যামেরিকার র‍্যাডিকাল কাগজপত্রে অথবা চ্যানেল সিক্স-এ। এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের হিসেব অনুযায়ী কত রাজনৈতিক বন্দী ছিল তখন সারা পৃথিবীতে? পঁচিশ লাখ? তার থেকে কয়েকশো বেশী হলে কি ক্ষতি? একদিনে চব্বিশ ঘণ্টায় কত মিনিট কত সেকেণ্ড? কিন্তু থিওরি অফ রিলেটিভিটি কি বলে। জেলের একদিনেও কি অত ঘণ্টা অত মিনিট?

ছয়। আই হ্যাভ এ ড্রীম

শাশার দোকানে রাজস্থান থেকে খাঁটি কারিগরের দল বসে থাকে তাদের এথনিক সাজপোষাক পরে— কেউ বুনতে থাকে জামাকাপড় কেউ হাতের কাজ করে যায় নিপুণ-গতিতে। দেখাদেখি সরকারী মেলাতেও ময়দানের প্যাভিলিয়নে দেখানো হয় একইরকম দৃশ্য। অথেনটিসিটির একটা ব্যাপার আছে তো। চারদিকে এত জৌলুশ আর এত উঁচু উঁচু বাড়ী উঠেছে— বিপ্লবের সময়ে ছিল না। অনেক কমরেডরা যারা জেল থেকে বেরিয়ে উঁচু বাড়ী তৈরী করার ঠিকেদারী করে দিনগুজরান শুরু করেছিল তারা কেউ কেউ এখন কোটিপতি কনসালট্যান্ট-আর্কিটেক্ট। প্রগতিশীল বাম সরকার আসার পর আমূল বদলে গেছে শহরের চেহারা। সংস্কৃতির দারুণ উন্নতি হয়েছে— রেসের মাঠ নিকটবর্তী এলাকা এখন এমন এক দারুণ কালচারাল কমপ্লেক্সে সমৃদ্ধ যা সারা দেশে কোথাও নেই— সেখানে কখনো আলো যায় না। এত মোটরবাইক আর স্কুটার চারদিকে — তারপর মেট্রোরেলে যাতায়াতের সুরাহা হয়েছে অনেক বেশী। অবশ্য নিন্দুকের অভাব কখনোই ঘটে না কোন দেশে। যারা কিছু পায়নি তারা ভ্যাঙায়, 'ধান্দামূলক

বস্তুবাদের' কল্যাণে নাকি দেশ ছেয়ে গেছে 'ডেমোক্র্যাসি অফ করাপশন'। কিন্তু এটা ঠিক, অনেক লোকের হাতে অনেক বেশী পয়সা এসেছে, অনেক নতুন নতুন রোজগারের ধান্দা বেড়েছে যেমন মিনিবাস, জমিবাড়ী, টিভি সিরিয়াল, যেখানে সেখানে বর্ষার ফনফনে লাউডগার মতন বেড়ে ওঠা নানারকম খবরকাগজ আর কাগুজে ধান্দা কিম্বা একটু সাবঅলটার্ন লেভেলে গেলে— অলিতে গলিতে রোলের দোকান— ফাস্ট ফুড কিংবা জাংক বাইট।

'জনগণ'-এর কি হয়েছে না হয়েছে ভেবে যারা খাবি খেত তারাও বুঝতে শিখেছে 'জনগণ' আসলে একটা এ্যাবস্ট্রাক্ট কনসেপ্ট। কিন্তু এমনকি 'জনগণও' যখন আসে সরকারী তাঁতমেলায় বা শাশার দোকানে অথেনটিসিটি বৃদ্ধির জন্য— তখনো কিন্তু মনে হয় না তারা সেইরকমের না খেতে পাওয়া খেটে খাওয়া জনতা যাদের বাচ্চাদের মাথাসরু পেটমোটা ছবি 'হু'-র পোস্টারে শোভাবর্ধন করতে দেওয়া যায় কিম্বা যাদের কঙ্কাল চেহারা নিয়ে 'দুর্ভিক্ষ সিরিজ'-এর একজিবিশন হতে পারে এ্যাকাডেমিতে। আর শোনা যায় না রাস্তায় রাস্তায় হারমোনিয়াম সহযোগে "মেদিনীপুরে মা বন্যা এসেছে"…। আসলে 'শ্রেণী' বা 'ক্লাস'-এর ধারণা তো— ফর এ্যানালিটিক্যাল কনভিনিয়েন্স। বিপ্লবের সময় যারা ছিল অত্যন্ত হরিজন অর্থাৎ যাদের খুনে কিম্বা সমাজবিরোধী আখ্যা দিয়ে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এখন সেটাই তাদের গর্বের কারণ— কে না জানে হরিজনদের দেশ ভারতবর্ষে এস-সি, এস-টি-দের আলাদা আদর। আর তাদের মধ্যে, যারা শুক্কুরবার শুক্কুরবার বের হওয়া গ্লসি খবরকাগজের ভাষায় 'ক্রিম দ্য লা ক্রিম' তাদের সাপ্তাহে টেনে নেয় এ্যামেরিকা-কানাডা কিম্বা জার্মানি। মাও পর্যন্ত বলেছিলেন মাস প্রোডাকশন এবং টেকনোলজি যদি শিখতে চাও এ্যামেরিকার দিকে তাকাও। তারা জানে কি করে গুণীর আদর করতে হয়। সেই সময় নিয়ে যেসব গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে চারদিকে স্বনামধন্য লেখকদের কলমে, বিশ্বখ্যাত পরিচালকদের ক্যামেরায়— ভাবতে গর্ব হয় তার নায়ক নায়িকারা অনেকেই আমার ছোটবেলার বন্ধু। বিশেষ করে ফিল্মের ব্যাপারে যে 'বুম' হয়েছে, অবাক করে দেওয়ার মতন।

আগে অলিতে গলিতে চায়ের আড্ডায় পকেটে ঘুরত মাও-এর লাল বই এখন ঘোরে ছবির স্ক্রিপ্ট। আমিও লিখে ফেলেছিলাম ওইরকম স্ক্রিপ্ট কিন্তু লাইন করতে পারিনি। কেউ কেউ বলছিল এইসব প্যারালেল ফিল্ম নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ হলে মন্দ হয় না— সেখানে এই বিকল্পছবির বা বিকলাঙ্গছবির ফেরিওয়ালাদের মুখোশ একটানে খুলে দেওয়া যায়। যারা বলছিল তারা অবশ্য কেউ টাকা পায়নি ছবির জন্য। তবে এইসব ওয়ার্কশপটপের একটা বেনিফিট হচ্ছে, ঠিকমতন ধোলাই লাগাতে পারলে ধোলাইকারীদের আপসে আপ খাতির করতে শুরু করবে এন. এফ. ডি. সি. কিম্বা টিভি। অবশ্য অন্য নানা ধরনের ওয়ার্কশপ বা সেমিনারে আমারো ডাক পড়তে শুরু করে অথেনটিসিটি বৃদ্ধির জন্য। ওই শাশার দোকানের এথ্নিক লোকজনের

মতন আর কি। এমনি একদিন একটা জমজমাট সংস্কৃতিমেলার শেষে ভোজনসভায় অকস্মাৎই দেখা হয়ে যায় মিতার সাথে। আরো সুন্দর লাগছে আগের চেয়ে। সেই প্রথর চোখ আর গোলাপী ঠোঁট— একাগ্র হয়ে চেয়ে দেখছিল আমাকে। ও হাসে "কি চিনতেই পারছ না যে একেবারে।" আমিও হাসলাম এই যেন কালকেই দেখা হয়েছিল এইরকম ভাবে। ভয়ে ভয়ে অবশ্য একবার চারদিকে চেয়ে নি। এটা সেই ডালহৌসির গোল গুদামঘরটা নয় তো! কোথাও তো ওয়াল পোস্টার নেই ঘন সবুজ জঙ্গলের কিম্বা নীলআকাশের ওপর দিয়ে উড়ে যাওয়া সাদা পাখীর। ঠিক আগের মতনই শাড়ী পরা পেঁচিয়ে। এতটুকু শরীর দেখা যায় না। ক্যানাডা থেকে ফিরে কি আরো কনজারভেটিভ হয়ে গেছে। "ওঃ আমার কর্তার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই" (আঃ 'কর্তা' আবার কি কথা? শুনলে 'মানসী' পত্রিকার সম্পাদিকা ধরে ধোলাই দেবে না··· ওই তো কাছে-পিঠেই আছে)। "যাবেন কিন্তু আমাদের বাড়ীতে, লাহিড়ীর কাছে আপনার কত গল্প শুনেছি।" কাগজে ছবি ওঠা চেনা চেহারার স্মার্ট ভদ্রলোকটি আমার দিকে হাত বাড়ায়। আমার অস্বস্তি লাগে। দেশে ফিরে বোধহয় আই.আই. এম. টেম-এ জয়েন করেছে। কোথা থেকে সন্দীপ এসে হাজির হয়— চিলের মত ছোঁ মেরে নিয়ে যায় আমাকে। কতদিন পরে দেখা— কতদিনের কথা— কতদিনের স্মৃতি যে জমা হয়ে গেছে। আমাকে রাশিয়ান ভোদ্‌কা খাওয়ায়। কি ভয়ংকর কড়া। আমার খুশী খুশী লাগে। আবছা হয়ে আসছে আলোর জৌলুশ। ওই তো আসছে সবাই আমার স্মৃতির এ্যালবাম থেকে। কেউ মাথায় চাঁটি লাগিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা আদর করে পিঠ থাবড়ে যাচ্ছে কেউ। আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে আমাকে পুরনো বন্ধুরা তাদের ছেলেমেয়েদের। আমি কি সাদা বাঘ নাকি? এসো এসো মা এদিকে আসছ না কেন? ক্রীমসন রং-এর স্কার্ট পরা মেয়েটা— সন্দীপের আন্ডারে সোসিওলজি নিয়ে রিসার্চ করছে, কি সুন্দর। আমাদের সময়কার মেয়েদের মতন ভারিক্কি গম্ভীর গম্ভীর ভাব নয় দেখো এখনো কত কাঁচ হয়ে আছে, কত ছোট্ট কত সুন্দর। সৌন্দর্যের ঢল নেমেছে যেন চারদিকে। তুমি তো বেজায় ভোঁদা হে! মানুষ কি দুঃসহ স্মৃতি নিয়ে আমরণ বেঁচে থাকে নাকি? কবে কি হয়েছিল ষাটের শেষ কি সত্তরের শুরুতে তাই নিয়ে আজীবন অশৌচ পালন করতে হবে? আমার চারদিক দুলতে থাকে, মাটি কেঁপে ওঠে। কানের কাছে কেউ দাড়ি নেড়ে বাণী শোনাতে আসছিল 'দোজ হু ফরগেট দি পাস্ট আর কনডেমড টু রি লিভ ইট' আমি লাথি মেরে সরিয়ে দিই। আরে দাড়ি নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছ বলেই সব আপ্তবাক্য চকচক করে গিলতে হবে নাকি? আশ্চর্য। সবগুলো দাড়িওয়ালা— কার্ল মার্কস, এঙ্গেলস থেকে শুরু করে আমাদের খোদ রবিঠাকুর— যাবতীয় ধর্মের ঠাকুরদের তো বাদই দিলাম। আর দাড়ি থাকা মানেই পরমজ্ঞানের লক্ষণ নাকি? আসলে কি হয়েছিল সেই ত্রয়োদশ না চতুর্দশ লুই-এর আমলে? যখন ক্ষুর-এর ব্যাপক প্রচলনে সবাই দাড়ি চাঁছতে শুরু করেছিল। গ্রাম শহর উজাড় করে যাবতীয় সুন্দরীরা মিছিল করে হাজির হয়েছিল

দরবারে। দাড়ি উৎখাত হওয়ার ফলে নাকি চুম্বনের স্বাদ আর পাওয়া যাচ্ছে না।

হুঁ হুঁ, আমাকে দাড়ি দেখিও না, আসল খবর সব ফাঁস করে দেব। কিন্তু এক—পৃথিবীর যাবতীয় দাড়িওয়ালা স্ট্যাচুগুলো আমাকে তাড়া করছে কেন? আমি ছুটতে থাকি, ছুটতে ছুটতে চোট খুলে যায় আবার লাগাই। অনেকগুলো স্যুভেনির দিয়েছিল ওরা। কাগজগুলো টুকরো টুকরো করে দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে মারি পেছনে। কেনা জানে ওই জ্ঞানীবুদ্ধরা আসলে জ্ঞানী ভল্লুকের মতনই ডেঞ্জারাস। ওই একদলা কাগজ পেলেই নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা করে দেখবে কি আছে ভেতরে, যতক্ষণ না পর্যন্ত দলা পাকিয়ে মণ্ড হয়ে যায়, আর ওই কাগজের দলা শুঁকলেই তাদের জ্বর আসে ঠিক একমিনিটের জন্য—জ্ঞানজ্বর বলা যায়। ততক্ষণে আমি ছুটে পালাতে থাকি আরো জোরে আরো জোরে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের পুরনো বাড়ীর সামনে হাজির হই। কোথায় সেই বাড়ী আর সবুজ শ্যাওলাধরা ছাত? এতো এক বিশাল মাল্টিস্টোরিড ফ্ল্যাট। দূর থেকে ক্যামেরা তাক করে থাকে একদল কাগুজে জনতা। তারা খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে হাসতে বীভৎস শিকারের আনন্দে ছুটে আসে। বুড়ো একটা দারোয়ান আমাকে পাঁজাকোলা করে পেছনের লিফটে নিয়ে যায়। "সোজা চলে যান বাবু টপফ্লোরে, টপফ্লোরে আর টপফ্লোরে উঠেই লিফটের গেট খুলে রাখবেন কিন্তু। আসছে ওরা আসছে।" ছাতের উপরের সুরম্য ফ্ল্যাটের দরজা ধাক্কা দিয়ে খুলেই সোফার ওপর লুটিয়ে পড়ি। সামনেই শুভাশিস আর ক্যামেরা তাক্ করা দিলীপ। "শোন, আফটার অল আমরা তোমার ছোটবেলার বন্ধু। প্রথম ইন্টারভিউএর স্কুপটা কিন্তু আমরাই নেবো।" আমার ভয়ংকর আশ্চর্য লাগে। "কেন কি হয়েছে?" শুভাশিস হাসে "কেন তোমার প্রথম ছবিটা কান ফেস্টিভালে ফার্স্ট প্রাইজ পেয়েছে—খবরে শোননি।" আমি অজ্ঞান হয়ে পড়তে পড়তে দিলীপ ধরে ফেলে। "কিন্তু তুমি তো জানই শুভাশিস। ছবিটা আমার তৈরীই হয়নি, কেননা এন. এফ. ডি. সি. টাকা দেয়নি। র‍্যাকেট, সব র‍্যাকেট।"

শুভাশিস হাসে। "ইনকরিজিবল্ র‍্যাকেট। জানিই তো। তাই আমরাও র‍্যাকেট করে তোমার না হওয়া ছবিটাকেই ফার্স্ট প্রাইজ পাইয়ে দিলাম। এখন দয়া করে শুরু করতো।" আমি ছুটে যাই ছাতের দেওয়ালে। মুখ ঝুঁকে দেখি অনেক নীচে থিকথিক করছে ভীড়। আমি চীৎকার করে উঠি। শোন শোন, আমার একটা পাঁচমিনিটের বক্তৃতা আছে শেষ দৃশ্যে। শোনই না। আরে গাধার দল, পাঁচমিনিটের বক্তৃতা শোনানোর জন্য একটা আস্ত ছবি করতে হয়েছিল চ্যাপলিনকে সে খবর রাখিস? আরে সবাই উঠে চলে যাচ্ছে কেন? আমার বক্তৃতা তো এখনো শুরু হয়নি। শুনতে পাচ্ছ তোমরা?

হায় আমার গলা কি অতদূরে পৌঁছুবে? □